আমার মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো

আমার মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো

প্রফেসর মীর্জা শামছুল আলম

আমার মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো
প্রফেসর মীর্জা শামছুল আলম
প্রকাশকাল * একুশে বইমেলা ২০২২
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
শান্তিকুঞ্জ মোড়, বিসিক রোড, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৫৫২-৪৬০৯৯৪, ০১৫৫৮-৪০৫৪৫৮
গ্রন্থস্বত্ব * লেখক
প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস * ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই * দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৩৫৫২-৫-০
ISBN: 978-984-93552-5-0
Amar Muktizuddher Dingulo by Professor Mirza Shamsul Alam
Published by Chayyanir. Shantikunja More, BSICIC Road,
Thanapara, Tangail, 1900.
Date of Publication: Ekushe Boimela 2022
Copy Right: Writer
Cover design & Book Setup: Chayyanir Computer
Price: TK. 150/- (One Hundred and Fifty Only)

উৎসর্গ

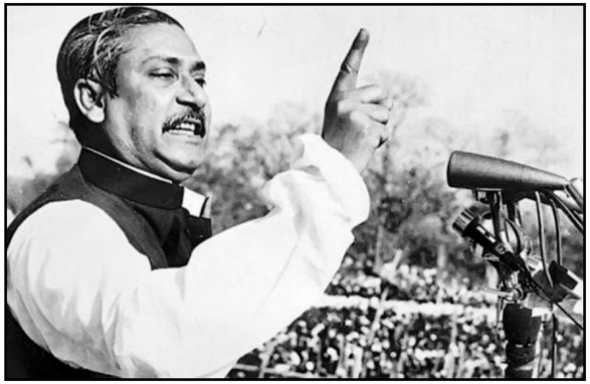

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

আমার জীবন সঙ্গিনী
কবিতা লেখায় উৎসাহদায়িনী
সহধর্মিণী
নাজমা সুলতানা ঝর্ণা
ও
আমার স্নেহের নাতি
আনাস মিহছান রাফান।

ভূমিকা

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফালগুন (২১ ফেব্রুয়ারি) আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার আমাদের চেতনা। ভাষা আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য অবদান। ভাষা আন্দোলনের মাঝেই **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিলো। বায়ান্নের রক্ত ভেজা পথেই স্বাধীনতার লাল সূর্য উঠেছে। বরকত, ছালাম, জব্বার, রফিক, সফিক, নাজমা, রৌসনারার বুকের তাজা রক্তেই আমাদের সংগ্রামী চেতনা জন্ম নিয়েছে। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে না পারলে সর্বস্তরে বাংলা উচ্চারণ ও শুদ্ধ করতে না পারলে শহিদের রক্ত দান বৃথা যাবে। ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। বাংলা ভাষা আমাদের আশা ভরসা আমাদের বাঙালি ঐতিহ্যের প্রকাশ। ভাষা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতিক।

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালির ওপর এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো। বাঙালিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। সেসময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা রুখে দাঁড়ায়। মা-মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য তারা অস্ত্র তুলে নেয় হাতে। সেই রণাঙ্গনের আমিও একজন যোদ্ধা। সেই যুদ্ধদিনের স্মৃতি নিয়ে রচিত হলো ‘আমার মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো’। এই বইটি লেখায় আমার অনেক ভুলত্রুটি আছে। পরম শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকা আপনারা বইয়ের ভুল ত্রুটিগুলো নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবেন। আপনারা আন্তরিকভাবে আমার এই বইটি মর্মার্থ সহকারে পড়লে আমি ধন্য হবো। যে শিক্ষা গ্রহণ করে তার মৃত্যু নেই। আল্লাহ হাফেজ।

লেখক

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ। আমি তখন বড়ইবাড়ি আলহাজ কাছিম উদ্দিন হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফিল্ড মার্শাল মো. আইয়ুব খান। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে মার্শাল ল জারি করেন। সারা বাংলায় সামরিক আইন জারি করে তিনি ঢাকাতে কারফিউ দেন। আমাদের শ্লোগান ছিল আইয়ুব শাহী ধ্বংস হউক সামরিক আইন তুলে নাও। বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাংলার মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও আস্থা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ। আমি তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। সামরিক আইন জারি করে ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতায় আসেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে কারফিউ দেয়া হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। ছাত্র আন্দোলন করতে যেয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ছাত্র আসাদ ভাই। আমি তখন চাপাইর ইউনিয়নের অন্তর্গত বড়ইবাড়ি আলহাজ কছিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১৫/৪/৬৯ তারিখে বড়ইবাড়ি হাই স্কুল শাখা ছাত্র লীগের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আমাকে সভাপতি নিযুক্ত করা হয়।

এই সম্মেলনে আসেন হিজলতলীর মফিজুর রহমান (মফিজ ভাই)। আসেন কালিয়াকৈরের শ্রীফলতলির দুলাল ভাই, বোয়ালি ইউনিয়নের ডাকুরাই গ্রামের আক্তার উজ্জামান (আক্তার ভাই) আরও অনেকে। অতিথিরা সবাই বক্তব্য রাখেন, আমি কমিটি গঠন করার পর স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে মাঝে মাঝে মিটিং করতাম বক্তব্য দিতাম। বক্তব্য শিখতাম কাঁঠাল গাছের উপরে চড়ে একা একা বক্তব্য দিতাম। চকে যেয়ে ক্ষেত সামনে নিয়ে বক্তব্য দিতাম। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বাংলার মহান অধিপতি গণজাগরণের নেতা বাংলার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে আমি অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছি। তিনি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মার্চ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৭ই মার্চ কালিয়াকৈর আসেন। কালিয়াকৈর বাজারে সভাতে তিনি বক্তব্য দেন। পরে গোলাম নবী হাই স্কুলে তিনি হালকা নাস্তা করেন। মিটিংটি ছিল সকাল ১০টায়। আমি গোলাম নবী হাই স্কুল থেকে বঙ্গবন্ধুর সাথে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ডে হিজলতলীর মাদু ভাইয়ের চা এর দোকানে যাই। বঙ্গবন্ধু এখানে বসেন এবং চা খান। আমাকে বলেন, 'ছাত্র সমাজকে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে এবং আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।'

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সারা বাঙালি জাতি গণআন্দোলনে মুখরিত ছিল। স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, হাটে, মাঠে সর্বত্র স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল বাংলাদেশ। আমি প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। বড়ইবাড়ি হাই স্কুল থেকে মিছিল নিয়ে ৬ মাইল পায়ে হেঁটে কালিয়াকৈর যেতাম। আমাদের স্লোগানের ভাষা ছিল পিন্ডি না ঢাকা ঢাকা ঢাকা, পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার

ঠিকানা, জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনব। টিনের চোঙা মুখে দিয়ে স্লোগান দিতাম। কালিয়াকৈর বাজারের ডাকবাংলোর পূর্ব প্রান্তে আমি একটি শহিদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করি।

দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাজীপুর এডভোকেট বার এসোসিয়েশনে আগমন উপলক্ষে আড়ম্বর পরিবেশে উপস্থিত মীর্জা শামছুল আলম।

বড়ইবাড়ি আলহাজ কছিম উদ্দিন ইনস্টিটিউশনের (বড়ইবাড়ি হাই স্কুলের) শহিদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর আমিই স্থাপন করি। কালিয়াকৈর দিনমজুর (কুলি) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। কালিয়াকৈর বাজার হোটেল শ্রমিক সমিতির আমি প্রতিষ্ঠাতা। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও এক হও' এ শ্লোগানটি আমি ছোটবেলা থেকেই বুকে ধারণ করেছি।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ। তখন আমি নবম শ্রেণির ছাত্র। পূর্ব বাংলা আন্দোলন সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন প্রচারণার জন্য বড়ইবাড়ি হাই স্কুলে আসেন চাবাগান ঠেঙ্গার বাদের কৃতী সন্তান কালিয়াকৈরের তথা পূর্ব বাংলার জননন্দিত নেতা জনাব শামছুল হক সাহেব। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি সমবায় মন্ত্রী, পাটমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত নির্বাচিত হন। তিনি আমাকে বলেন, 'আন্দোলন সংগ্রামে তোমাদেরকে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে।' ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের ১৬৭টি আসনে আওয়ামী লীগ জয় যুক্ত হয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয় লাভ করে।

আমি দেওয়ান বাড়ির মৌ. মো. তোরাব হোসেন, মেদী পালোয়ান বাড়ির জনাব হাবিবুর রহমান পালোয়ান, জনাব ছানোয়ার হোসেন পালোয়ান দেওয়ান বাড়ির জনাব কদ্দুছ দেওয়ান, জনাব হালিম দেওয়ান মাস্টার জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব সামসুল হক সাহেবের নির্বাচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করি আমরা সবাই। আমাদের শ্লোগান ছিল 'ভোট দিন ভোট দিন নৌকা মার্কায় ভোট দিন', 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশে।' জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ তখন আমি বড়ইবাড়ি হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। বাংলার মুক্তিকামী মানুষ গণ জাগরণে ফেটে পড়েছিল। মাঠে ময়দানে অলিতে গলিতে গণজোয়ার এসেছিলো। অফিস আদালত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সবার বুকেই ছিল অনির্বাণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের, অত্যাচারের, বৈষম্যের হাত থেকে বাংলার মানুষ মুক্তি চেয়েছিল। ৩ জানুয়ারি তৎকালীন ঢাকা রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। ২৮ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।

১৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হকের সাথে করমর্দন করছেন মীর্জা শামছুল আলম।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ তৎকালীন রমনা রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা জয় বাংলা' স্লোগান সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা স্লোগান দিতাম 'জয় বাংলা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর। তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব। তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা। আর নয় প্রতিবাদ এবার নেবো প্রতিশোধ। বঙ্গভবন না রাজপথ রাজপথ। পিণ্ডি না ঢাকা ঢাকা।'

৭ মার্চের ভাষণ শুনে আমি প্রত্যয় গ্রহণ করলাম বাংলাকে আমরা স্বাধীন করব মুক্ত করব স্বদেশ মাতৃভূমি। ২৫ মার্চ দিবাগত রাত্রে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ ১২টা ২০ মিনিটে (২৬ মার্চ রাত) বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি লিখেন এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছো এবং যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। ২৬ শে মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা এমএ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা পত্রটি পাঠ করেন।

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ২৮ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন সফিপুর বাজারে পাঁকা সড়কের উপরে স্ট্যান্ডে ঢাকাগামী পাঞ্জাবিদের জিপে পশ্চিম দিক থেকে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী একটি জিপ গাড়ি নিয়ে এসে পাকিস্তানি হানাদারদের জিপের পেছনে গুলি চালায় এবং সাথে সাথে দ্রুত কাদের সিদ্দিকী ভাই টাঙ্গাইলের দিকে চলে যায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরই পাকিস্তানি সৈন্য টাঙ্গাইল চলে আসে। ঐদিন আমি সফিপুর বাসস্ট্যান্ডে উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদার সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও খন্দকার আব্দুল বাতেন ভাইকে আমি অনেক কাছ থেকে দেখেছি। কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে আমার আন্তরিকতা আছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদ কামাল ও মির্জাপুর উপজেলার জুগীর কুফা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা মজিবুর রহমান ও মির্জাপুর বহুরিয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে আমার খুব আন্তরিকতা আছে ।

টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার কুড়িপাড়া গ্রামের মধুর টেকী গ্রামের হযরত আলী মামাকে সাথে নিয়ে মির্জাপুর থানার পাথরঘাটা গ্রামের ডাক বাংলোতে কয়েকদিন প্রাথমিক ট্রেনিং নিলাম। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসলাম নিজ গ্রাম মেদী আশুলাইতে। এখানে এসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছুটিতে আসা হাবিলদার মেজর সেনাবাহিনীর আর্টিলারিকোরের লাবিব আমাদের ট্রেনিং করান। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ গভীর রাত্রে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকে অতর্কিতে হামলা করে। হাজার হাজার পুলিশ মারা যায়। বিভিন্ন ছাত্রাবাসে, হল, হোস্টেলে, বাসা, বাড়িতে হামলা চালায়। ইহাতে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আহত হয় অনেক মানুষ। ২৬/২৭ মার্চ শত শত আহত মানুষ ঢাকা ছেড়ে গ্রামের পথ ধরে পায়ে হেঁটে দিক বিদিক ছুটে চলে। ঐ সময় অনেক আহত মানুষ কালিয়াকৈর বাসস্ট্যান্ডে এসে জড়ো হয়। তাদের আর্তচিৎকারে আমি এবং আবু নাছির আহম্মেদ (উপসচিব) ভাই বলিয়াদী ভবনে রাত্রি ১২টার সময় চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকীর কাছে যাই এবং তিনি গাউন পরে আমাদের সাথে দেখা করেন। আমরা বলি যে বাসস্ট্যান্ডে আহত মানুষদের জন্য আপনি বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেন।

মাননীয় সমবায় মন্ত্রী রহমত আলীর সাথে একান্ত সাক্ষাতে প্রফেসর মীর্জা শামছুল আলম।

চৌধুরী জমিদার তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী সাহেব আমাদের দুইজনকে বললেন আপনারা জঙ্গলে যান আত্মরক্ষা করুন দেশ সেবার চেয়ে আত্মরক্ষা বড়। আমি ঢাকা থেকে বলিয়াদী ভবনে পালিয়ে এসেছি। তার কিছুদিন পরেই তানভীর সাহেব শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। লাবিব উদ্দিন আহমেদ আমাদেরকে মেদীর গুলবাহার মাঠে ট্রেনিং দেন। পরে বাঁশের লাঠি দিয়ে রাইফেল তৈরি করে বড়ইবাড়ি ফুটবল খেলার বড় মাঠে সামরিক প্রশিক্ষণ দেন। পরবর্তীতে যুদ্ধকালীন লাবিব ভাই শহিদ হন। অধ্যাপক আবু নাছির আহাম্মেদ বড়ইবাড়ির মোয়াজ্জেম ভাই বড়ইবাড়ি হাই স্কুল মাঠে আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমি ছিলাম ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের স্কুল শাখার সভাপতি। মো. আব্দুল্লাহ মালেক ছিল সাধারণ সম্পাদক। আমাদের স্লোগান ছিল–

'বাঁশের লাঠি তৈরি কর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ জয়দেবপুর প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজীপুরের বলিষ্ঠ নেতা জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক। আ. ক.ম. মোজাম্মেল হক একটি আন্দোলনের নাম, একটি সংগ্রামী চেতনার নাম। এখান থেকে আন্দোলনের প্রেরণা পাই, মুক্তিযুদ্ধে যাবার শক্তি সঞ্চয় করি। সারা বাংলায় স্লোগান উঠে 'জয়দেবপুরের পথ ধর আন্দোলন গড়ে তোল।' জয়দেবপুরের পথ ধর অস্ত্র কাঁধে যুদ্ধ কর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

স্বাধীন হবার পর আ.ক. ম. মোজাম্মেল হক সাহেব দীর্ঘদিন ধরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী।

এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দেবার পর আমাকে রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার বানানো হয়। আমি এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হই। আমার কাজ ছিল মেদী কাঞ্চনপুর গ্রামের কোন লোক পাকহানাদার বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে কিনা, কেউ দালালি করে কিনা, কেউ রাজাকারে যায় কিনা, কেউ গোয়েন্দাগিরি করে কিনা এগুলো সম্পর্কে খেয়াল রাখা। সার্বক্ষণিক ডিউটি করতাম। কিছুদিন যাবার পর আমি মনে মনে স্থির করলাম আরো ভালভাবে অস্ত্র চালনার জন্য আমি ভারতে যাব, ট্রেনিং নেবো, প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করব।

ইতোমধ্যে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে মার্চ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের এক পল্টন সৈন্য ঢাকা থেকে কালিয়াকৈর থানার অন্তর্গত ঢোল সমুদ্র গ্রামে ঢোল সমুদ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে আশ্রয় নেয়। আমি সেই সকল সৈন্যদের সান্নিধ্যে আসি এবং আমি, প্রফেসর মোয়াজ্জেম ভাই, আবু নাসির আহম্মেদ তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। আমাদের সাথে অন্যরাও গ্রামবন্দি ছিলো। এলাকাবাসী আন্তরিক সহযোগিতা করেছিলো। আমার কমান্ডার আমি মেদী আশুলাই গ্রামের আব্দুল লতিফ মামার কাছে বুঝিয়ে দিয়ে ভারত যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। লতিফ মামা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কালিয়াকৈর উপজেলার দুই বার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ছিলেন।

বড়ইবাড়ি হাই স্কুলের মাঠের সামনে হতে আমরা কয়েকজন নৌকায় চড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। যথাক্রমে ডাবুরাই গ্রামের উপসচিব জনাব আবু নাসির আহম্মেদ। ঢোল সমুদ্র গ্রামের প্রফেসর জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন। গুলয়া গ্রামের জনাব আব্দুল্লা হেল বাকী। বড়ই বাড়ী (আষারিয়া বাড়ি) গ্রামের জনাব আব্দুর রাজ্জাক রাজু ভাই। গুলয়া গ্রামের ফটিকচন্দ্র সরকার দাদা। নলুয়া গ্রামের জনাব মহর আলী ভাই।

প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার জনাব আমিরুল ইসলামের সাথে গাজিপুর এডভোকেট বারের সহসভাপতি মীর্জা শামছুল আলম।

মেদী গ্রামের আমি ইতোমধ্যে বড়ইবাড়ি হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ডাকুরাই গ্রামের সপ্তম শ্রেণির বাবলু ও পিপড়াছিটি গ্রামের নবম শ্রেণির ছাত্র ছালাম শহিদ হন। তাদেরকে কালিয়াকৈর থেকে ধরে নিয়ে জয়দেবপুর কড্ডার ব্রিজের উপর পাক হানাদার বাহিনী বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে দুজনকে হত্যা করে। পরে নদীতে ফেলে দেয়। ওরা আর মা বাবার কাছে ফিরে আসেনি। আমি ওদের নামে বড়ই বাড়ি হাই স্কুলের হোস্টেলের নামকরণ করতে প্রস্তাব করেছি বাবলু ছালাম হোস্টেল।

নৌকার মাঝি দিন রাত্রি সমানে নৌক বেয়ে চলল। এক সময় আমরা চারগাছ বাজারে এসে রাত্রি জাগরণ করলাম। ভোরে ৮ টার সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শেল গুলি এসে বাজারে পড়তে থাকল। হানাদার বাহিনী গুলি করতে করতে বাজারের প্রায় কাছাকাছি আসতেই আমরা নৌকার পূর্ব দিকে সরে গেলাম এবং একটি বাড়ির ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে পুকুর ধারে বাঁশ ঝাড়ের নিচে শুয়ে পড়লাম নৌকার সবাই। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকহানাদার বাহিনীর গুলি পাল্টা গুলি চললো। আমার দুই কানের কাছ দিয়ে গুলি সাঁ সাঁ করে যেতে লাগলো। আল্লামালিক কিছু সময় পর আমরা নৌকার মাঝিকে আরো পূর্ব দিকে সরে যেতে বললাম। বাড়ির মালিক আমাদের নৌকার কাছে এসে বললো হে আল্লাহ তুমি কি নাই? তুমি যদি থেকে থাকো তাহলে আমার দুইটি মেয়ে ও স্বামী স্ত্রী আমাদেরকে রক্ষা কর। বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার আর চিৎকার। হায়রে নিষ্ঠুর নিয়তি আমাদের নৌকায় জায়গা না হবার কারণে পরিবারটি বিপদের মধ্যে রেখে আমরা পূর্ব দিকে সরে যেতে যেতেই আর্তচিৎকার শুনলাম। ধাও ধাও করে আগুন জ্বলে উঠলো। পাকবাহিনী বাড়িটিতে আগুন দিলো। আমরা ধোয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেলাম। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। পরে শুনলাম ঐ বাড়ির কেউ আর বেঁচে নাই। আমাদের নৌকা বর্ডারের দিকে আস্তে আস্তে যেতে লাগলো। সামনের দুই নৌকা বোঝাই শরণার্থী যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাচ্ছিলো তাদেরকে পাকবাহিনী গুলি করে পানিতে ফেলে দেয়। এক সময় আমরা বিডঘর যাওয়ার পর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমি কাঞ্চনপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী ছামান উদ্দিন ভাইয়ের সান্নিধ্য পাই। পরবর্তীতে তিনি চাপাইর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ছিলেন। এক নৌকা বোঝাই মুক্তিযোদ্ধা ওরা মেরে ফেলে। এ দৃশ্য দেখার পর আমরা পেছনের দিকে সরে আসি এবং স্থানীয় মসজিদে আশ্রয় নেই। আমরা নৌকা নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। এ যাত্রায় যে যার মত যার যার বাড়ি ফিরলাম। ভারত যাওয়া হলো না। পুনরায় দ্বিতীয়বার ট্রেনিং এর জন্য ভারত যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমার 'মা' আমাকে বললেন তুমি আবার ভারত যাও ট্রেনিং নাও বাংলাদেশকে তোমরা স্বাধীন কর। শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঁচাও। আমার মা তৎকালে ভালো শিক্ষিত ছিলেন। আমি একদিন হঠাৎ করে দেওয়ানপাড়া মৌলভী তোরাব হোসেন সাহেবদের বাড়ি গেলাম। যেয়ে অপরিচিত তিনজন লোক দেখতে পেলাম। আমি বললাম আপনারা কারা। তারা এক এক করে আমার কাছে নাম বললেন। একজনের নাম সৈয়দ আনোয়ারুল হক, আর একজন বললেন, আমার নাম মাহবুব আর একজন বললেন, আমার নাম শাহিনুর। আমি বললাম আপনারা কি জন্যে এ বাড়িতে আসছেন। তারা বলল এরা আমাদের আত্মীয়। আমি বললাম আপনাদের বাড়ি কই। তখন তারা বললেন, আমাদের তিন জনের বাড়ি বরিয়াবহ গ্রামে। আমি বললাম আপনারা কোথায় যাবেন? তারা বলল আমরা মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং-এর জন্য ভারত যাব। তারা আমাকে বলল আপনি যাবেন নাকি ভারতে?

টাঙ্গাইল মির্জাপুর কলেজে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জমির উদ্দিনের আগমনে জনসভায় বক্তৃতারত প্রফেসর মীর্জা শামছুল আলম।

আমি বললাম আমি আপনাদের সাথে ভারত যাবো। বাড়ির মালিক মৌলভী তোরাব হোসেন সাহেব তার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম, ছেলে কদ্দুছ ভাই, বাকী ভাই, হালিম ভাই, মেয়ে সুফিয়া আক্তার ও জাহানারা বেগম, ছেলে ছোট শরিফ সবাই আমাকে উনাদের সাথে ভারত যাবার জন্য উৎসাহ দিলেন। বললেন এদের সাথে গেলে কোনো অসুবিধা নাই। আনোয়ার ভাই বললেন আপনি বাড়ি যান আমরা হাঁটতে থাকি। আমি বাড়ি এসে ভাই মীর্জা আবুবকর সিদ্দিক, বোন মীর্জা ছালমা আক্তার (বীণা), ভাই মীর্জা মনিরুল হক, ভাই মীর্জা ওয়াদুদ হোসেন, বোন মীর্জা কামরুননাহার সবাইকে ভারত যাবার কথা বললাম। এক পর্যায়ে মাকে সালাম করে বাবাকে বলে বাড়ির বাহির হলাম। কতদূর হাঁটার পর পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমার ছোট বোন কামরুন দৌড়াচ্ছে। আমি তাকে বললাম, বাড়ি যাও আমি ফিরে আসব। সে কান্না করতে লাগল আমি তার হাতে ১টি টাকা দিয়ে বললাম, বোন তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

আমি হাঁটতে হাঁটতে গবির চালা করিম পালোয়ানদের বাড়ির কাছে যেয়ে তাদের তিন জনকে পেলাম এবং তাদের সাথে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। হাঁটতে হাঁটতে শ্রীপুরের কাউরাইদ রেল স্টেশনের কাছে পাকবাহিনী ক্যাম্প পার হলাম। আনোয়ার ভাই বললেন আমরা কয়েকদিন আগে কাউরাইদ রেল স্টেশনের কাছের ক্যাম্পে বোমা মেরেছিলাম। আমাদের পায়ে হাঁটা ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিলো না। তবে মাঝে মধ্যে নৌকা যোগে যেতাম। যেমন তালের নৌকায় প্রচণ্ড ঢেউয়ের মধ্যে মেঘনা নদী পার হয়েছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে যেখানে রাত্রি হয় সেখানেই মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নেই। মানুষ আমাদেরকে আন্তরিকতার সাথে আশ্রয় দেয়। ১৫ দিন হাঁটার পর আমরা ৪ জন কুমিল্লা বর্ডারের কাছে এসে থামলাম। এখানে অনেক শরণার্থী ছিল। আমরা এবং শরণার্থীরা মিলে রাত্রে ছোট ছোট নৌকায় চরে সীমান্তের কাছে একটি বটগাছ ছিলো সেই বটগাছের নিচে আশ্রয় নিলাম। বর্ডার পার হওয়ার নিয়ম হলো এখানে দালাল ধরতে হয় যাদের সাথে রেল লাইনের উপরে ক্যাম্পে রাজাকারদের সাথে সম্পর্ক আছে। দালালরা আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কোথায় যেন চলে গেলো আর আসে না। এ দিকে ভোর হয়ে যাচ্ছে প্রায়। রেল লাইনের কাছ দিয়ে গাড়ি চলার রাস্তায় পাকহানাদাররা গাড়ি নিয়ে এ্যাম্বুশ করে টহল দিচ্ছে। ভোর হলেই সূর্যের আলোতে আমাদেরকে দেখা যাবে। দেখা গেলেই পাকবাহিনী আমাদেরকে এবং আমাদের সাথে থাকা শরণার্থীদের মাথায় গুলি করবে। এই অবস্থায় আল্লাহর নাম স্মরণ করে ঘনঘন দোয়া পড়তে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ করে দালালরা এসে আমাদেরকে বলল রাস্তা ক্লিয়ার আপনারা তাড়াতাড়ি চলেন। রেল লাইনের কাছে যেতেই রাজাকাররা রেল লাইনের উপরে দাঁড়াল এবং আমাদেরকে পার করে দিলো। রেল লাইন পার হয়েও উপায় নাই। কারণ রেল লাইনের পূর্বদিকে ভেতরে প্রায় ৪/৫ মাইল বাংলাদেশের সীমানা। চার পাঁচ মাইল হাঁটার পর একটি খেয়া নৌকা পার হয়ে আমরা ভারতের মাটিতে পরলাম। একটি পুকুরে গোসল করে ১টা রুটি আর ডাল খেলাম। তারপর হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ৭/৮ মাইল হাঁটার পর আমরা আগরতলায় এসে পৌঁছালাম।

আগরতলায় এসে দেখি এখানে টঙ্গীর জনাব হাকিম মাস্টার এমএনএ সাহেব। কাজী মোজাম্মেল সাহেব। এখানে আরও অনেক নেতারা ছিল তাদের সবার নাম এই মুহূর্তে আমার মনে নাই। পাকবাহিনীর নিক্ষেপ করা শেলগুলি আগরতলাতে এসে পড়ে দুই জন লোক মারা গিয়েছিলো। হাকিম মাস্টার সাহেব আমাদের চারজনকে ডাল ভাত খেতে দিলেন। শরণার্থীরা যে যার মত ছড়িয়ে পড়লো। আগরতলাতে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর একটি জিপ গাড়ি এসে আমাদেরকে ইছামতি ক্যাম্পে নিয়ে এলো।

২৯ নভেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দে গাজিপুর জেলা আইনজীবী সমিতি আয়োজিত ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সন্ত্রাসী জেএমজি কর্তৃক বোমা হামলায় শহিদ আইনজীবীগণের স্মরণে শোক সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তৃতা করছেন গাজিপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট মীর্জা শামছুল আলম।

এখানে এসে দেখি সাকাশ্বর গ্রামের দেওয়ান মো. ইব্রাহীম ভাই, সাভারের খান মো. ছবুর ভাই, বাঙ্গুরী গ্রামের মোহাম্মদ আলী ভাই, বাগাম্বর গ্রামের আব্দুল ওহাব ভাই এদের সবাইকে পেয়ে আমি দারুণভাবে আনন্দিত হলাম। ওহাব ভাই আর আমি মাটি হাতে নিয়ে শপথ করলাম আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করব এবং আমরা বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের সেবা করবো। ইছামতি ক্যাম্পে অবস্থান করলাম ১ মাস ১৪ দিন। এখানে দারুণ শীত, একটি পাতলা কম্বল ছাড়া শীতের সম্বল আমাদের আর কিছুই ছিলো না। রাত্রে গাছের মুথা জ্বালিয়ে সারারাত্রি জেগে থাকতাম। দিনের বেলা সামান্য ঘুমাতাম। খাবার ছিল সকালে ১টা রুটি দুপুরে অল্প ভাত। ভাতের মধ্যে ৫২ নাম্বার ডাল নিলে আঙ্গুলের সমান পোকা ভেসে উঠতো। ৫২ নাম্বার ডাল বলা হয় এই কারণে যে খালি পানি ছিলো। সামান্য কয়টা ডাল থাকতো।

রাতে ১টা রুটি পেতাম। এইভাবে এই ক্যাম্পে ১ মাস ১৫ দিন কেটে যায়। ইছামতি ক্যাম্পে অবস্থান করার পর আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতের হেজামারাতে। এখানে বেশ কিছুদিন অস্ত্র চালনার ট্রেনিং ও শারীরিক ট্রেনিং নিলাম। আমাদের ট্রেনিং মাস্টার ছিল সুবেদার ছবদের আলী ওস্তাদ। ট্রেনিং শেষে আমাদের গ্রুপ কমান্ডার নিযুক্ত হলেন দেওয়ান মো. ইব্রাহীম ভাই। পরবর্তীতে তিনি গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ট্রেনিং নেয়ার পর আমাকে ভারতের অস্ত্রাগার পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি নিষ্ঠার সাথে গার্ডের দায়িত্ব পালন করি। ভারতের অস্ত্র রাখা হয় পাহাড় কেটে খন্দক তৈরি করে সেই খন্দকের ভেতর। তারপর দেওয়ান ইব্রাহীম ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা চলে আসি কুমিল্লা বর্ডারে। সবাইকে অস্ত্র দেয়া হয়, আমাকে ২টা অস্ত্র দেওয়া হয়। ১টা হলো থ্রি নট থ্রি রাইফেল আর ১টা হলো ব্রিটিশ স্টেনগান। আমাদের গ্রুপের ৪৫জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল যথাক্রমে মৌচাকের শাহাবদ্দিন আহসান পরবর্তীতে তিনি কালিয়াকৈর থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের কমান্ডার নিযুক্ত হন। ৪৮ বৎসর ও দায়িত্বে ছিলেন। দেওয়ান ইন্তাজুল ইসলাম সিনাবহ সুহরাব হোসেন গ্রাম বান্দারা, মোশারফ হোসেন গ্রাম মৌচাক বাগাম্বরের আবদুল ওহাব ভাই পরে তিনি মৌচাক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। আরো অনেকেই আমাদের গ্রুপে ছিল।

দীর্ঘ ৪৮ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে সবার কথা আমার মনে নেই। আমাদের কুমিল্লা বর্ডারের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে রাত দিনে পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তার জন্য ডিউটি করতে হতো। একদিন আমার উপর নিরাপত্তার জন্য সিকিউরিটি গার্ডের দায়িত্ব পরে। আমি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ডিউটি করতেছি। রাত্রি ৩টার সময় একটা জিপগাড়ি এসে আমাদের ক্যাম্পের একটু দূরে থামল। আমি দেখি গাড়ি থেকে ক্যাপ মাথায় এক ভদ্রলোক নেমে আমাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি আসছে। আমি হোল্ড বলে তাকে থামালাম এবং নাম জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল আমি ৩নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল সফিউল্লাহ।

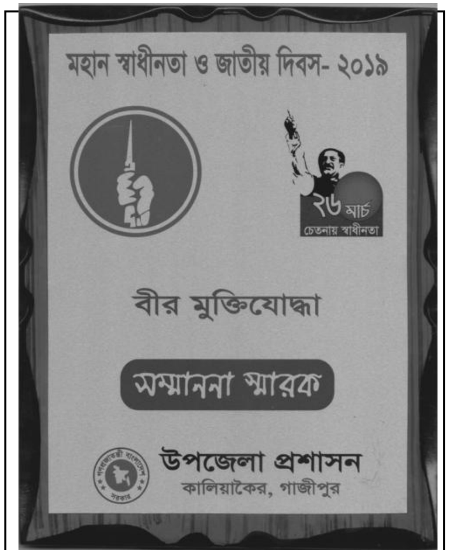

[illegible] ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বহু সম্মাননা লাভ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম কালিয়াকৈর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে থেকে প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মারক সম্মাননা।

কর্নেল সাহেব আমার পিঠে থাপ্পর দিয়ে বললেন জয় বাংলা সত্যিই বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। তোমরা এগিয়ে যাও সাবাস বাংলাদেশ। তারপর তিনি আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শনে গেলেন।

আমরা ভারতে অবস্থান করাকালীন টাঙ্গাইলের জনাব কাদের সিদ্দিকী ও নাগরপুরের খন্দকার আব্দুল বাতেনের মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর বিজয়ের কথা শুনে আবেগে আপ্লুত হতাম। আবেগের মাঝে একদিন আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো পাক হানাদার বাহিনীর সাথে কুমিল্লা বর্ডারে সম্মুখ সমরে। এখানকার যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী আমাদের সাথে ছিল। আমাকে একটি বাঙ্কারে রাইফেল দিয়ে বসানো হলো। ভারতীয় বাহিনী আমাদের পেছনে থাকতো। তারা পিছনে থেকে কাবারিং ফায়ার দিতো গুলি করতো। রাত্রি করে বাংকারে বসে বসে আমি গুলি করলাম। এখানে বিরাট যুদ্ধ হলো। পাকবাহিনীর সৈন্য নিহত হয়। আমাদের মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সামান্য ক্ষতি হয়েছিলো।

যুদ্ধকালীন অনেক খণ্ড যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। যেমন চারগাছ যুদ্ধ, বর্ডার যুদ্ধ, বংশাই কাউরাইদ যুদ্ধ।

আমরা যুদ্ধ করতে করতে পায়ে হেঁটে বাংলাদেশের ভেতরে আসলাম। এসে আমরা মৌচাক একটি বিহারীর পরিত্যাক্ত বাগান বাড়িতে ক্যাম্প করলাম। কিছুদিন এখানে অবস্থান করার পর বাংলার পূর্ব আকাশে স্বাধীনতার লাল সূর্য দেখা দিলো। ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর আসল। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। বিজয়ের উল্লাসে সারাদেশ উল্লাসিত হলো। একদিকে বিজয়ের উল্লাস আর একদিকে সন্তানহারা মায়ের কান্না, মা হারা সন্তানের কান্না, পুত্র হারা পিতার কান্না, পিতাহারা পুত্রের, কন্যার, স্বামীহারা স্ত্রীর কান্না, স্ত্রী হারা স্বামীর কান্নায় আকাশ বাতাস শোকে মুহ্যমান হয়ে উঠলো। ৩০ লক্ষ মানুষের রক্ত আর ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বদৌলতে পেলাম স্বাধীনতা। মৌচাক ক্যাম্পে অবস্থান করে বাড়িতে মাকে পত্র লিখলাম 'মাগো আমি ফিরে এসেছি বাবা ভাই ছোটবোন কামরুনকে এ সংবাদটি দাও।' আমি ১০ দিন পর আমার অস্ত্র ২টা ১টা থ্রি নট থ্রি আর ১টা ব্রিটিশ স্টেনগান বেশ কিছু গোলা বারুদ নিয়ে মেদী সাইদের চালা বাড়ি গেলাম। বাড়ি যেয়ে নানা হাফেজ উদ্দিন পালোয়ান, মামা হাবিবুর রহমান পালোয়ান, মামা জয়নাল আবেদীন পালোয়ান, মামা নূরুল হক পালোয়ান, মামা শামসু পালোয়ান, মোজাম্মেল হক পালোয়ান সবার সাথে দেখা করে দুই তিনদিন পর আবার টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার অন্তর্গত আমার পৈতৃক বাড়ি জুগীর কুফাতে সবার সাথে দেখা করতে যাই। যথাক্রমে আমার দাদা মীর্জা সিবার উদ্দিন, চাচা মীর্জা শহিদুর রহমান (আবু), চাচা মীর্জা লুৎফর রহমান (ছানা), চাচা মীর্জা সামছুল আলম (সামা), চাচা মীর্জা আবু মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার (আজাদ), বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদৎ হোসেন (ফনু)। দেখা করতে গেলাম মির্জাপুর শহরে। এখানে দেখা হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো. একাব্বর হোসেন সাহেবের সাথে। পরবর্তী সময়ে তিনি তিন বার মির্জাপুর টাঙ্গাইল ৭ আসনের এমপি নির্বাচিত হন এবং তিনি সভাপতি ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির। আরো দেখা করলাম পুষ্ট কামুরি গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী, মনি ভাই, হিতেস চন্দ্র, পুলক সরদার ও মীর্জা মজিবরের সাথে। আয়নাল হক সাহেবের সাথে দেখা, জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। বীর মুক্তিযোদ্ধা হলাম। সকলের সাথে দেখা হবার পর আমি আমার হাতে থাকা অস্ত্র নিয়ে ফিরে এলাম মৌচাক ক্যাম্পে। বিজয়ের আনন্দের পালা আরম্ভ হলো। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারিতে সাভার ক্যান্টনমেন্টে অস্ত্র জমা দিতে হবে। যথা সময়ে আমরা

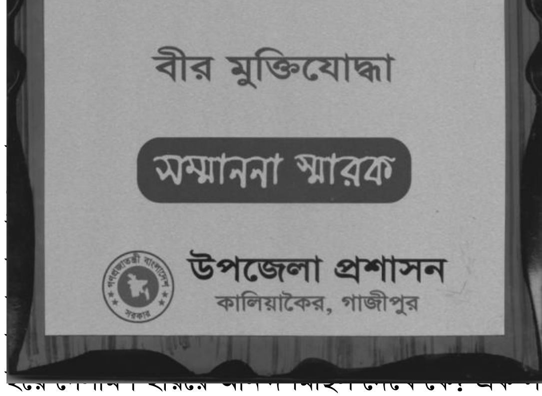

জমা দিতে প্রস্তুত হলাম
ম। আমি বাসের ছাদের
থাকলাম বন্দুক উচিয়ে।
দিকে খইয়ের মত গুলি
। আমাদের স্লোগান ছিল
আমরা আনন্দে আত্মহারা
ময় আমাদের গাড়ি বহর সাভার ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছাল। আমরা ডিসিপ্লিন মত অস্ত্র জমা দিতে আরম্ভ করলাম। আমরা অস্ত্র জমা দিলাম ভারতীয় ক্যাপ্টেন বালা হারার কাছে।

অস্ত্র জমা দেয়া শেষ হবার পর আমরা সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা গাড়িবহরে আবার স্লোগান দিতে দিতে কালিয়াকৈর ফিরে আসলাম।

বেশ কিছুদিন পর আমাদেরকে সনদ পত্র দেয়ার জন্য ঢাকাতে ডাকা হলো। আমি ঢাকা গেলাম এবং আমাকে সনদপত্র দেয়া হলো। যার মধ্যে লেখা আছে জয় বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র। মুহাম্মদ আতাউল গনী ওসমানী, অধিনায়ক, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী।

ম আহমদ। আঞ্চলিক অধিনায়ক ৩ নম্বর সেক্টর। সনদে আরো লেখা আছে মীর্জা শামছুল আলম। পিতা মীর্জা মহিদুর রহমান। গ্রাম মেদী আশুলাই ডাকঘর বড়ইবাড়ি, থানা কালিয়াকৈর, জিলা ঢাকা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক। তিনি ৩নং সেক্টরে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদান চির উজ্জ্বল হয়ে রইবে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরপরই বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী সাহেবের প্রদত্ত সার্টিফিকেট পাই। তারপর পর্যায়ক্রমে আমার নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গেজেট হয়।

১। বাংলাদেশ গেজেট নং- ২৮১৮, জুলাই ২০০৬।
২। মুক্তিবার্তা নং ১৮০০২ (লাল বই) তাং ২০০৬/০৭২৩
৩। মন্ত্রণালয় সনদ নং- ১৮৭৫৩১ ২০০৫-০২-১৭
৪। মুক্তিযোদ্ধা আইডি নং ০৩০৩৪০১০৯।
৫। সেক্টর নম্বর-৩।
৬। মুক্তিযোদ্ধা তালিকা নং- ০১০৬০৫০০২৪
৭। সদস্য তালিকা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ- ৩১১৮০০২
৮। ভাতা বই নং- ০২০৪৫২৮০০০৫৯৬/৫৯ AC

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের মা বোনেরা মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য দিয়েছেন, কেরিয়ারের কাজ করেছেন। তারামন বিবিসহ অনেক মা বোন মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। তাদের অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। আন্দোলন, মিটিং, মিছিল করলাম। রাজপথে রাস্তা ঘাটে হাটে মাঠে সর্বত্র স্লোগান দিলাম, মুক্তিযুদ্ধ করলাম বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। এখন লেখা পড়া শিখে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার পালা, আমি ফিরে আসলাম বড়ইবাড়ি আলহাজ কছিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে। এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশ পত্র নিলাম। আমি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পরীক্ষার্থী ছিলাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে যাবার কারণে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষা দেয়া হয় নাই।

আমি মেদী আশুলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ৫ম শ্রেণি পাস করি। আমার প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন মাস্টার।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আমি বাংলাদেশের প্রথম ব্যাচে এসএসসি পরীক্ষা দেই এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস করে। আমার সাথে আমার ক্লাসের বড়ইবাড়ির আব্দুর রাজ্জাক ভাই (রাজু) সিনাবহের সদানন্দ অধিকারী, অমূল্য দাদা হাটুরিয়াচালার মজিবর ভাই সিনাবহের আরো অনেকেই ছিল। আমাদের এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল টাঙ্গাইল, করটিয়া সা'দত কলেজে।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আমি কালিয়াকৈর ডিগ্রি কলেজ থেকে ভালভাবে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করি। উল্লেখ্য যে এই কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমি জিএস পদে ও আরফান ভাই ভিপি পদে নির্বাচন করি। আমাদের প্যানেল ছিল ছাত্রলীগ থেকে। বলিয়াদীর জনাব চৌধুরী তানভীর আহাম্মদ সিদ্দিকীর নির্দেশে ৬বার ভোট গণনার পর আমাকে ১ ভোট কম দেখিয়ে ফেল করানো হয় এবং বিএনপি ছাত্রদলের আব্দুল খালেক ভাইকে পাস দেখানো হয়।

জনৈক ২ জন শিক্ষক ভোট গণনার সময় আমার ভোটের ৮টি ব্যালট পেপার খেয়ে ফেলেন।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে আমি করটিয়া সা'দত কলেজ থেকে বিএ অনার্স (ইতিহাস) দ্বিতীয় বিভাগে পাস করি। উক্ত কলেজ-এ (Sucso) ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমি ছাত্রলীগ থেকে জিএস পদে এবং কামরুজ্জামান (কামরু) ভাই ভিপি পদে নির্বাচন করি।

কামরুজ-শামছু পরিষদ

বিপুল ভোটে আমাদের প্যানেল বিজয়ী হয়। প্যানেলের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমার মনে আছে মাত্র। যেমন এজিএস অজয় কুমার সাহা, মহিলা সম্পাদিকা মুকুল আপা, বেবী আপা সাহিত্য সম্পাদিকা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুস ছামাদ। ভোটে পাস করার পর আমি যখন কলেজে পদার্পণ করলাম তখন ওয়াজিদ আলী খান পন্নী হোস্টেলের ছাত্র ভাইয়েরা ইব্রাহীম খাঁ ছাত্রাবাসের হিন্দু ভাইয়েরা ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রী নিবাসের বোনেরা সারিবদ্ধভাবে আমার গলায় মালা পরিয়ে দিলো। আমি আনন্দ মিছিল নিয়ে করটিয়া সা'দত বাজারে গেলাম। এখানে দোকানদার ভাইয়েরা বলল আমরা ফুলের মালা দেব না আমরা ফুলের ঝাঁকা, ডালা ধরে আপনার মাথায় দেব। সত্যি সত্যি তারা ফুলের ঝাঁকা আমার মাথায় ঢেলে দিলো। ততক্ষণে ভিপি কামরুজ্জামান ভাই কলেজে পৌঁছায় নাই। হায়রে আনন্দ! হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান ১৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আনন্দে একাকার হয়ে গেলো। সে দৃশ্য আমার হৃদয়ে আজও জেগে আছে।

করটিয়া সরকারি সা'দত কলেজের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মচারীবৃন্দ এবং আমার সাথী সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোনদের আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি করটিয়া সা'দত কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) হবার পেছনে যাদের অবদান আছে তারা হলেন নাগরপুরের জনাব খন্দকার আব্দুল বাতেন ভাই এমপি সাবেক ভিপি। সা'দত কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি, জনাব সৈয়দ আব্দুল মাজেদ হোসেন, বাড়ি গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার বারিয়াবহ গ্রামে ।

করটিয়া সা'দত কলেজের সর্বত্র পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ ও কর্মচারী, স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিরপুশিয়া গ্রামের ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস আব্দুর রাজ্জাক ভাই।

করাতিপাড়া গ্রামের সা'দত কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস স্নেহের ছোট ভাই জিন্নাহ বীর পুশিয়া করাতিপাড়া কান্দাপাড়া ও করটিয়া গ্রামের সকল ভাই ও বোনেরা আমাকে দারুণভাবে সহযোগিতা করেছে। তাদের অবদান

ইতিহাসে অম্লান হয়ে রইবে। বিরপুশিয়ার আজমত ভাই কামরুজ-শামসু স্লোগান দিতে দিতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো।

আমি ১৯৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ টেলিভিশন জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি এবং শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হই। আমার সাথী ছিল টাঙ্গাইলের আজাদ ভাই এবং কামরুল ভাই। বিতর্কের বিষয় বস্তু ছিল 'ডাক্তারদের গ্রামে যাবার পথে পারিপার্শ্বিকতা নয় মানসিকতাই প্রধান অন্তরায়'। আমরা ছিলাম মানসিকতার পক্ষে।

রাজশাহী নাটোর কলেজ হেরে যায়। বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে আমাকে যে সার্টিফিকেট দেয়া হয় তাতে লেখা আছে, 'অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানান হচ্ছে যে, মীর্জা শামছুল আলম সা'দত কলেজ, টাঙ্গাইল জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন।'

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই এবং নিয়মিত লেখাপড়া করি। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হই। প্রেসিডেন্ট জনাব এরশাদ সাহেবের মার্শাল ল না থাকলে আমি ঢাকসু নির্বাচনে জিএস পদে দাঁড়াতে পারতাম এবং সাধারণ সম্পাদক হতাম।

সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা বিবৃতি মিছিল আরম্ভ করেছিলাম। এরশাদ সাহেবের সামরিক আইন একাধারে ৬ বৎসর ছিল। আর এগুতে পারলাম না। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে আমি ঢাকা ধানমণ্ডি ল কলেজ থেকে ল' পরীক্ষা দেই এবং সাফল্যের সাথে ল' পাস করি। আমি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে আমি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে সনদ পরীক্ষা দেই এবং আমি পরীক্ষা পাশ করে এলএলবি সনদ লাভ করি। সনদ প্রাপ্তির পর আমি টাঙ্গাইল এডভোকেট বারে জয়েন করি। টাঙ্গাইল বার এসোসিয়েশনের সকল আইনজীবী ভাই ও বোনের সাথে আমার হৃদ্যতা আছে।

কালিয়াকৈর থানাধীন চাপাইর ইউনিয়নের অন্তর্গত মেদী আশুলাই বাজারের উত্তর দিকে যে রাস্তাটি চলে গেছে ঐ রাস্তাটি আমার নামে দেয়া হয়েছে। সড়কটির ফলকে লেখা রয়েছে:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
বীর মুক্তিযোদ্ধা
মীর্জা শামছুল আলম
সড়ক
সৌজন্যে: উপজেলা পরিষদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

২৩/৮/১৯৯৪ তারিখে আমি গাজীপুর এডভোকেট বারে যোগদান করি। আমার সদস্য নাম্বার ১৮৪। গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন ২০১২-২০১৩ খ্রি. আমি সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ মনোনীত মো. আ. ছোবহান, আলহাজ মো. সামছুল আলম প্রধান পরিষদে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচন করি এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ভোট হয়। ভোটে আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে আমি নির্বাচিত হই। একটানা ২৫ বৎসর যাবৎ আমি উক্ত বারে প্রাক্টিস করছি। আমার সহকারী এডভোকেট দুলাল ও রোমা আক্তার।

আমার রাজনৈতিক পরিচয়

আমি যখন ৫ম শ্রেণিতে পড়ি তখন থেকেই আমার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। মা, মাটি মানুষকে ভালোবাসতে শিখি। আমি বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহজগতে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, স্রষ্টাই সর্বেসর্বা। ৫ম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হই। বড়ইবাড়ি হাই স্কুলে লেখাপড়ার সময় আমি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হই। কালিয়াকৈর কলেজে লেখাপড়ার সময় আমি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। সা'দত কলেজের সাধারণ সম্পাদক হই। এখানে ১টা ঘটনা আমার মনে আছে।

একবার কলেজে অনেক কম্বল আর বড় ডিব্বা ভর্তি দুধ এলো। নেতৃস্থানীয় হিসেবে আমার বণ্টকে একটা সবুজ রঙের কম্বল ও এক ডিব্বা দুধ পেলাম। সাথে সাথে একজন বৃদ্ধ মহিলা এসে আমাকে বলল, বাবা আমি বুড়া মানুষ শীতে কষ্ট পাই। একথা বলার সাথে সাথে আমার কম্বলটি বৃদ্ধ মহিলাকে দিয়ে দিলাম। একটু পরে বাচ্চা কোলে আর একজন মহিলা এসে বলল আমার বাচ্চার দুধ কিনতে পারি না। সাথে সাথে দুধের ডিব্বা তাকে দিলাম।

আমি এক সময় এনজিওটাতে চাকরি করতাম। ৮৮ খ্রিস্টাব্দের ভয়াল বন্যায় আমি বলিয়াদী চৌধুরী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীর বাড়িতে ক্যাম্প করে বন্যার্ত মানুষকে সাহায্য করেছিলাম। হাজার হাজার মানুষকে খিচুরি খাইয়ে ছিলাম। আমার সাথে সোলাটির শাশিরঞ্জন মৌলিক, কুন্দা হাটার মোহাম্মদ আলী, ঢাকার মহিবুল ভাইসহ আরও অনেকেই ছিল। চারগাছের সাইফুল্লাহ (আকিবুকি) ছিল। বড়ইবাড়ির আলী আজম। কালিয়াকৈর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন, চাপাইর গ্রামের নজরুল ইসলাম ভাই, আমি ছিলাম সাধারণ সম্পাদক।

করটিয়া সা'দত কলেজের ছাত্র সংসদের জিএস হিসেবে মাঠে বক্তৃতারত মীর্জা শামছুল আলম।

আমরা দুজন নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি। করটিয়া সরকারি সা'দত কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। গাজীপুর জেলা ছাত্র লীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলাম। গাজীপুর জেলা আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কালিয়াকৈর উপজেলা আওয়ামী লীগের একটানা ১২ বৎসর মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক ছিলাম।

দীর্ঘ ২৭ বৎসর আমি টাঙ্গাইল মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনা করেছি। জিবি বোর্ড কলেজ পরিচালনা পরিষদ ও নিবেদিত শিক্ষক মণ্ডলীর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ঋণী। মির্জাপুর কলেজের শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। মির্জাপুর উপজেলা টাঙ্গাইল এর আওয়ামী লীগের একটানা কয়েক বৎসর শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ছিলাম। সেই সুবাদে আমি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ মো. একাব্বর হোসেন

সাহেবের সান্নিধ্য পেয়েছি। সাধারণ সম্পাদক শরিফ মাহমুদ, পৌরচেয়ারম্যান শাহাদৎ হোসেন সুমন, মো. মাজহারুল ইসলাম (শিবলু) ওয়াহিদ শামীম, মির্জাপুর কলেজের সাবেক জিএস মো. ফারুক আরো অনেকের সাথে আমার আন্তরিকতা আছে।

কর্মমুখর কলেজে যে সকল পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্মচারী ভাইবোনদের সহযোগিতা সহমর্মিতা পেয়েছি, কলেজ উন্নয়নে যাদের অবদান ইতিহাসে চিরদিন অম্লান হয়ে রবে। সেই সকল শিক্ষক কর্মচারীর নাম আমি এই গ্রন্থে উল্লেখ করছি।

- জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ (বাবর), সাবেক অধ্যক্ষ
- জনাবা খাদিজা ইয়াসমিন, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
- জনাব আব্দুল গণি অধ্যাপক, অর্থনীতি।
- অধ্যাপক নিরঞ্জন কুমার সাহা (সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
- অধ্যাপক হরিনারায়ন সাহা, ইংরেজি বিভাগ
- মরহুম উপাধ্যক্ষ হারুন অর রসিদ
- অধ্যাপক শক্তিপদ ঘোষ
- সহকারী অধ্যাপক শিবপদ ঘোষ।
- জনাব পারভেজ সাজ্জাদ খান, ব্যবস্থাপনা।
- মো. জাহাঙ্গীর আলম
- আমার অন্তরের জামিল হোসেন, ইতিহাস বিভাগ
- ছানোয়ার হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
- সহকারী অধ্যাপিকা ফারজানা রহমান
- সাইফুল ইসলাম (ক্রীড়া শিক্ষক)
- মির্জা মাজহারুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
- মো. শহীদুল্লাহ, ইংরেজি বিভাগ
- মো. আ. মালেক শিকদার, ইসলাম শিক্ষকা
- সহকারী শিক্ষক অধ্যাপক সাহাদৎ হোসেন, প্রাণিবিদ্যা
- সাহা প্রাণ গোপাল প্রদর্শক
- আব্দুল করিম, প্রভাষক কৃষি শিক্ষা
- সহকারী অধ্যাপক এসএম নূরুল ইসলাম
- ইকবাল হোসেন, পদার্থ বিদ্যা
- মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান, প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান
- মো. শফিকুল ইসলাম, প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান
- মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, দর্শন
- অধ্যাপিকা মদিনা খানম, সমাজকর্ম বিভাগ
- অধ্যাপক জনাব আবদুল ছালাম, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
- অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র তরফদার।

রাজবন্দী হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় আমাকে রাজবন্দী হিসেবে বন্দী করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিকিউরিটি ওয়ার্ডে রাখা হয়। আমাকে গ্রেফতার করা হয় কালিয়াকৈর থানার চাপাইর ইউনিয়নের মেদী আশুলাই গ্রামের বহেড়াচালা গজারী বনের ভেতর রফিকদের বাড়ি থেকে রাত্রি ৩টার সময়। আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সাইদের চালা গ্রামের বাড়ি ১২ বার রেড হয় (ঘেরাও হয়)। আমি বন্দী হবার পরে মাকে দেখার জন্য একটু আবেদন করেছিলাম কিন্তু আমার আবেদন নিবেদন কোনটাই শুনা হয় নাই। আমাকে ভোরে থানায় নিয়ে আসা হয়। আমাকে দেখার জন্য হাজার হাজার লোক থানাতে জড়ো হয় এবং সকলেই বলে মীর্জা শামছু খুব ভালো লোক ভালো ছেলে।

এক রাত্রি আমাকে থানায় রাখা হয়। রাত্রি ৩টায় আমাকে লক আপ বন্দী অবস্থা থেকে বাহিরে নদীর ধারে নিয়ে হাত পা বেঁধে শুইয়ে দেয়া হয়। প্রহার বেত্রাঘাত করতে থাকলে তখনই থানাতে টেলিফোন আসে। আমাকে সাথে সাথে বন্দী অবস্থা থেকে খুলে দেয়া হয়। পরে জানতে পারি খন্দকার আব্দুল বাতেন ভাইয়ের খালাতো ভাই কর্নেল ইলিয়াস উপর থেকে টেলিফোন করেছে। সকালবেলা অফিসারেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে আমাকে দেখে। সকালে থানা থেকে ঢাকা জেলের উদ্দেশ্যে আমাকে গাড়িতে তোলা হয়।

গাড়িতে তোলার আগে আমি কালিয়াকৈর বাসস্ট্যান্ডে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেই। জনগণ আমাকে বলে যে আমার কোনো ভয় নাই আমরা আপনার সাথে আছি। লোকমান ভাই পারেতো আমাকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। যে যা পারে আমাকে কিনে দেয়।

আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা ডিএসবি অফিসে। এখানে আমাকে মানুষ নির্যাতনের রুম ঘুরিয়ে দেখানো হলো। তারপর আমাকে একটি অন্ধকার রুমে বন্দী করে ৬ রাত্রি ৬ দিন রাখা হলো। সূর্য উঠলে পাখি ডাকলে বুঝতাম এখন ভোর হয়েছে। ৬দিন নির্যাতন করার পর ৭ দিনের দিন আমাকে গাড়ি

করে ঢাকা জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে প্রবেশ করার পর ভাবলাম যে আর কখনও বাহিরের আলো বাতাস দেখতে পাবো না। রাজবন্দী হিসেবে আমি জেলের ভেতরে থাকতাম সিকিউরিটি ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডের দক্ষিণ পাশ দিয়ে ৮ নাম্বার সেলে যাবার রাস্তা। এখানে ফাঁসির আসামীদের রুম সাথে ফাঁসির মঞ্চ। তখন বগুড়াতে বিমানসেনারা অভ্যুত্থান করে জিয়াউর রহমানের সময় ১৭ বার সেনা বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহীদের জেলের ভেতরে রাখা হয় বন্দী করে ৫নং বিল্ডিং ও ৭নং বিল্ডিং এর ভেতরে। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর বগুড়াতে সেনা বিদ্রোহ হয়।

বন্দী হবার ২ মাস পর আমার ছোট বোন বীনা আমাকে জেল গেটে দেখতে আসে। গ্রামের জনৈক মামা আমার মায়ের কাছ থেকে আমাকে জেল থেকে মুক্ত করার মিথ্যা কথা বলে পাঁচ হাজার টাকা নেয়।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ৮ই অক্টোবর জেলের ভেতরে ৫নং খাতা থেকে বিমান সেনাদের নামিয়ে এনে জেল গেটে বলা হতো তোমার মৃত্যুদণ্ড। তখন সেনারা কেঁদে ফেলতো। তাদেরকে ৩/৪জন অন্য সেনারা ধাক্কাতে ধাক্কাতে সিকিউরিটি ওয়ার্ডের জানালার পাশ দিয়ে নিয়ে যেতো। আর সেনা অফিসার ও সৈনিকরা কাঁদতে কাঁদতে বলত আমার কি অপরাধ আমার মাকে দেখতে দাও স্ত্রী, ছেলে মেয়েদের দেখতে দাও। অপরাধ কি? আমাকে জানতে দাও। প্রথম ১ জন করে নিয়ে যেতো ফাঁসির মঞ্চে ১০ মিনিট পরেই স্ট্রেচারে সাদা কাপড়ে ঢেকে আসত লাশ। আমরা বন্দীরা জানালা খুলে প্রতিদিন এ মৃত্যু দেখেছি। প্রথম ১ জন পরের দিন ২জন পরের দিন ৯৪ জন। সর্বোচ্চ ১০ জন এক সাথে ফাঁসি দেয়া হতো। এ দৃশ্য বড়ই করুণ। সাধারণ সৈনিক এবং সেনা অফিসার সব মিলিয়ে আমি ১৩১ জনের লাশ দেখেছি।

তখন আমার সাথে সিকিউরিটি ওয়ার্ডে (রুমে) বন্দী ছিলো কমরেড মণিসিংহ, কমরেড ফরহাদ ভাই, কমরেড জামাল ভাই। ধামরাইর চৌহাটের ইলিয়াস ভাই, চৌহাটের আতাউর রহমান আতা ভাই, ধামরাইর করিম ভাই, সাটুরিয়ার শামছুল আলম (জকি) ভাই, মানিকগঞ্জের লেনিন ভাই, শামসু ভাই, জনাব শাজাহান সিরাজ ভাই, খন্দকার আব্দুল বাতেন ভাই, আসম আব্দুর রব ভাই আরো অনেকেই তখন বন্দী ছিলো।

জেলের আড়ালে যে সকল ঘটনা ঘটে সেই সকল ঘটনা প্রবাহ নিয়ে বন্দী অবস্থা থেকে একটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছি। যার নাম দিয়েছি 'বন্দি খাঁচার বুলি' এই লেখা খাতাটা তৎকালীন বিএনপি সরকার আটক করেছিলো। অনেকদিন পর আমি একজন পুলিশের মাধ্যমে খাতাটি উদ্ধার করি।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্বমানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। আমি মুক্তি পেয়ে মেদী আশুলাই গ্রামে মায়ের কাছে ফিরে আসি। মা আমাকে দুধ দিয়ে গোসল করিয়ে দেন। ২/১ দিন পর আমি কর্মী সাথী বন্ধুদের সাথে দেখা করি।

আমাদের দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের কারণে। কেননা, সেদিন যদি তারা স্বার্থের কথা না ভেবে ঝাঁপিয়ে না পড়তেন বর্বর হানাদার বাহিনীর উপর তাহলে স্বাধীনতার লাল সবুজের পতাকা আমরা পেতাম না, পারতাম না বিশ্ব দরবারে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হতে। নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে উপহার দিয়েছেন আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। তাঁদের আত্মত্যাগের জন্যই আজ আমরা বাঙালি, বাংলা ভাষায় কথা বলি। তাদের মধ্যে এমন একজন হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মীর্জা শামছুল আলম এডভোকেট (বিএ অনার্স এমএ, এলএলবি)। তিনি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মেদী আশুলাই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মীর্জা মো. মহিদুর রহমান এবং মাতা শামছুন্নাহার। চার ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনিই প্রথম। ছোট থেকেই তিনি খুব শান্ত স্বভাবের ছিলেন। খেলাধুলা করতে পছন্দ করতেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মেদী আশুলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাস করেন। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় তার ভেতর দেশাত্ববোধ এবং দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসার জন্ম নেয়। এর ফলস্বরূপ তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর কালিয়াকৈর থানার চাপাইর ইউনিয়নের বড়ইবাড়ি হাই স্কুল থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পাস করে কালিয়াকৈর ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর সা'দত কলেজ, করটিয়া থেকে (অনার্স) ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক পাস করেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সা'দত কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস ছিলেন। এরপর ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর (এমএ) পাস করেন।

তিনি প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার করিমগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। এরপর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে যোগদান করেন উত্তরা হাবিবজামান কলেজে। দুই বছর সেখানে অধ্যাপনা শেষে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে মির্জাপুর, টাঙ্গাইল কলেজে অধ্যাপনা শুরু করে দীর্ঘ ২৭ বছর অধ্যাপনার পর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু বর্তমানে

গাজীপুর এবং টাঙ্গাইল এডভোকেট বারে ওকালতি করছেন। তিনি গাজীপুর কোর্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন ২০১২ খ্রিস্টাব্দে।

পারিবারিক জীবনে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নাজমা সুলতানার সাথে। সহধর্মিণী কালিয়াকৈরের নামাশুলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত। তিনি এক ছেলে এবং এক মেয়ের জনক। ছেলে মীর্জা রহমান সামজিদ উজ্জাস ইংরেজিতে অনার্স অধ্যয়নরত এবং মেয়ে মীর্জা শামীমা সুলতানা তানজিল মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে এমবিএ পাস করেছেন।

তিনি মির্জাপুর উন্মুক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কোঅর্ডিনেটর। ল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নানা সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত আছেন। তিনি মির্জাপুর উপজেলার প্রফেসর পাড়া গ্রামের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আব্দুস ছামাদ, আব্দুল মজিদ, আজিজুল হক হীরাসহ এলাকাবাসীর সহযোগিতায় একটি মসজিদ ও প্রফেসর পাড়ার মেইন রাস্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি কালিয়াকৈরের থানার চাপাইর ইউনিয়নের সাইদের চালা গ্রামে হারুন অর রশিদ পালোয়ান, করিম পালোয়ান, ছানোয়ার হোসেন পালোয়ান ও এলাকাবাসিকে নিয়ে আরও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মেদী আশুলাই গ্রামে ছাত্র কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। এই মেদী গ্রামেই তার নানার বাড়ি। নানা ছিলেন নাছিম উদ্দিন পালোয়ান।

এছাড়াও তিনি টার্ড নামক একটি বিদেশি এনজিওতে কাজ করেছেন। এগুলোর পাশাপাশি তিনি লেখালেখিও করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি 'বন্দি খাঁচার বুলি' নামক একটি বই রচনা করেন । তিনি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি বহু পুরস্কার (ক্রেস্ট) এবং সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তিনি ২০০5 খ্রিস্টাব্দে বিটিভি কর্তৃক আয়োজিত 'ইতিহাস কথা কয়' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সাক্ষাৎকার দান করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণে ভারত গমন কালে চারগাছ বাজার বর্ডার এলাকায় পাকবাহিনীর আক্রমণে পড়ে যান। তখন তাঁদের দল আত্মরক্ষার জন্য সেখানকার পূর্বদিকে অবস্থান গ্রহণ করলে একটি বাড়ির ভেতর থেকে কয়েকজন নারী এবং পুরুষের আর্তচিৎকার শুনতে পান এবং কিছুক্ষণ পরই পাকিস্তানি হানাদাররা সেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে বাড়িতে অবস্থানকারী প্রতিটি সদস্যের করুণ মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা আজও তাকে বিমর্ষিত করে তোলে। মা,মাটি, মানুষ, দেশকে ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসতেন তিনি। সেজন্য নিজের দেশের মাটি এবং দেশ মাতৃকাকে রক্ষা করার জন্য একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন দেশের সেবায়। আর সেই ধারাবাহিকতার রেশ ধরে তিনি আজও দেশের মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন এবং যতদিন বেঁচে আছেন দেশ এবং দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখার ব্রত গ্রহণ করেছেন।

প্রফেসর পাড়া মাস্টারপাড়ার মসজিদ, রাস্তা, ঘাট, বিদ্যুৎ, গ্যাস উন্নয়নে যে সকল সমাজ হিতৈষী মানুষের অবদান রয়েছে, তারা হলেন প্রফেসর বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শামছুল আলম (বিএ অর্নাস এমএ, এলএলবি, এডভোকেট) প্রফেসর মরহুম এসএম মেহেদী, প্রফেসর মরহুম আব্দুল্লাহ হারুন, প্রফেসর মরহুম মজিবুর রহমান, জনাব এসএম হান্নান, এডভোকেট হোসাইন আলী, প্রফেসর আজমল হক খান, অধ্যক্ষ জনাব সৈয়দ আলী আকবর, খাদিজা ইয়াসমিন ভারপ্রাপ্ত (অধ্যক্ষ), প্রফেসর মরতুজ আলী খান, প্রফেসর সৈয়দ জগলুল, প্রভাষক শফিউদ্দিন, প্রফেসর মরহুম হারুন অর রশীদ। ম্যাজিস্ট্রেট শাম্মী আক্তার। আব্দুস ছামাদ, আব্দুল মজিদ, জনাব আজীজুল হক হীরা। কাজী শামসুল আলম, শাহ বজলুর রহমান বিজু ভাই, শরিফ খন্দকার, আফছার উদ্দিন, আব্দুল ওয়াহেদ উদ্দিন। সুমন হক, জনাব ছানোয়ার হোসেন খান, জনাব হালিম মাস্টার, জনাব পারভেজ আলী খান, তোফায়েল আহমেদ, জনাব, ফাহিমদ্দিন (কহি) মান্নান ভাই শহিদ ভাই, স্ত্রী মরিয়ম আক্তার। জনাব বাচ্চু মেম্বার তালুকদার, জনাব কবির মাস্টার, শাহরিয়ার রিংকু ভাই নজরুল ইসলাম।

ছাত্র রাজনৈতিক জীবনে ও পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে আমি যে সকল মহান পরম শ্রদ্ধেয় নেতা মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় মন্ত্রী এমপিদের সান্নিধ্য পেয়েছি ও যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তারা হলেন বাংলার প্রথম প্রেসিডেন্ট বজ্র কণ্ঠ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কালিয়াকৈরের বাজারে জনসভা করার পর বাসস্ট্যান্ডে যাবার পথে আমার সাথে আলোচনা হয়েছে। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের সাথে কালিয়াকৈরের গোলাম নবী হাই স্কুল মাঠে জনসভায় পরিচয় হয়। আমি টাঙ্গাইল কাগমারীর বাড়িতে যাই তার সান্নিধ্য পাই কথা বিনিময় হয়। প্রেসিডেন্ট হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ কালিয়াকৈরের গোলাম নবী হাই স্কুল মাঠে এলে জনসভাতে আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেই সুবাদে তার সাথে আমার কথা হয়। সে আমাকে বলে

'আপনিতো খুব সুন্দর বক্তৃতা করেন'। প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ স্পিকার থাকা অবস্থায় ঢাকাতে তার সাথে আমি মানবাধিকার সংস্থায় সভাতে একত্র বক্তৃতা করেছি। সে আমার বক্তৃতার দারুণ প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মির্জাপুর কলেজে এসেছিলেন। তিনি শহিদমিনারের কাছে ক্রিসমাচ ট্রি গাছের চারা রোপন করার সময় আমি তার সাথে কথা বলেছি। সে আন্তরিকতার সাথে কলেজ সরকারিকরণের প্রসঙ্গে বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একবার গাজীপুর আইনজীবী সমিতির মিটিং-এ প্রধানমন্ত্রী হবার আগে এসেছিলেন সেইসময় তার সাথে কথা হয়। সফিপুর আনছার ক্যাম্পে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার পর এসেছিলেন আমি উক্ত সভাতে দাওয়াতপত্র পেয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে তার সাথে কথা হয়। জননেতা জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক সাহেবের সাথে আমার আন্তরিকতা ও গভীর শ্রদ্ধা আছে। টাঙ্গাইল আর একবার গাজীপুর এডভোকেট বারের নির্বাচনে পাস করার পর প্যানেলের সবাই ঢাকাতে তার সাথে দেখা করতে যাই এখানে আমি বক্তৃতা রেখে ছিলাম। তার সাথে আমাদের গ্রুপ ছবি আছে। বাংলার সমবায় মন্ত্রী কালিয়াকৈরের কৃতী সন্তান জনাব শামছুল হক সাহেব মন্ত্রী হবার পর তিনি কালিয়াকৈরে কয়েকবার জনসভা করেছেন। আমি তার প্রত্যেকটি জনসভাতে বক্তৃতা করেছি। তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঢাকাতে রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা দানকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। দানবীর রণদা প্রসাদ সাহাকে আমি অনেক কাছ থেকে দেখেছি কথা বলেছি, তার নাটমন্দিরে বক্তৃতা দিয়েছি। মন্ত্রী জনাব রহমত আলির জনসভাতে আমি বক্তৃতা দিয়েছি। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আ. ক.ম মোজাম্মেল হক সাহেবের সাথে আমার একান্ত পরিচয়। তার অগণিত জনসভাতে আমি বক্তৃতা দিয়েছি। স্বাধীনতার ইস্তেহার পাঠক মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান সিরাজের সাথে আমার দারুণ আন্তরিকতা ছিলো। তার বহু জনসভাতে আমি একত্রে বক্তৃতা দিয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনকারী ঢাকসুর ভিপি আ.শ.ম. আব্দুর রবের ভাইয়ের সাথে মন্ত্রী হাছানুল হক ইনু ভাইয়ের সাথে আমার প্রাণের মানুষ এমপি খন্দকার আব্দুল বাতেন ভাই ও এমপি ফজলুর রহমান খান ফারুক ভাইসহ বহু রাজনীতিবিদ জ্ঞানী গুণিদের সাক্ষাৎ পাই।

১০-১-২০১৫ জানুয়ারি বাংলার মহান অধিপতি বাংলার জাগরণের নেতা বাংলার সিপাহশালার জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আমার মেয়ে মীর্জা শামীমা সুলতানা তাঞ্জিল (এমবিএ, প্রথম শ্রেণি) আমাকে বলে যে 'আব্বু তোমরা না মুক্তিযুদ্ধ করেছো তুমি মুক্তিযুদ্ধের উপরে কিছু লিখ একটা বই লিখ' কথাটা শোনার পরে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম আমিতো লেখক নই, তবে কিভাবে একটি বই লিখব। দুই তিন দিন ভাবার পর আমি স্থির করলাম যেহেতু আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেহেতু আমার যুদ্ধকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবনের কিছু ইতিকথা দিয়ে অবশ্যই একটি বই লিখবো। এখন বইটির নাম কি দেয়া যায় ভেবে চিন্তে আমার একান্ত কাছের মানুষ জনাব পারভেজ আলী খানকে বললাম। তিনি বললেন বইটির নাম হবে 'আমার মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো'।

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার যে সকল সেকশন ও গ্রুপ কমান্ডার গণ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধরত ছিলেন নিম্নে সেই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম শ্রদ্ধার সাথে লেখা হলো।

গুলয়ার ডিএ, কাইউম থানা কমান্ডার ছিলেন। সাকাশ্বর গ্রামের দেওয়ান মো. ইব্রাহিম ভাই গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন। চাবাগান গ্রামের আনোয়ার ভাই গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন। চানপুর গ্রামের খন্দকার আবদুস ছালাম ভাই সেকশন কমান্ডার ছিলেন। বোয়ালী গ্রামের শামসুদ্দিন সরকার ভাই সেকশন কমান্ডার ছিলেন। বড়চালা গ্রামের শামছুল হক ভাই সেকশন কমান্ডার ছিলেন। গুসাই বাড়ি গ্রামের জনাব হাবিবুর রহমান ভাই সেকশন কমান্ডার ছিলেন। সরোয়ার আলম ভাই ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার বর্তমানে চাপাইর গ্রামের নাছির ভাই আছেন ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমান্ডার, আবু সাঈদ বালা ভাই আছেন সদস্য, দেওয়ান ছামাদ সদস্য।

বাংলার ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস। আমরা বাংলার মানুষ সবাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চলার পথে পাথেয়। দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা। আমরা সবাই বাঙালি বাংলা আমাদের ভাষা বাংলা আমাদের আশা। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে আমরা সবাই সোনার মানুষ হতে চাই। আমরা সবাই দেশের উন্নয়নের জোয়ারে জনতার জয়গান গাইবো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের অহঙ্কার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের গর্ব। যতদিন বাংলার মাটি আর মানুষ থাকবে ততদিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অম্লান থাকবে।

'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছো মহান'

মীর্জা বংশে জন্ম আমার কিন্তু দারিদ্র্যতা ছিলো আমার ও পরিবারের নিত্যদিনের সাথী। মির্জাপুর টাঙ্গাইল থানার অন্তর্গত জুগীর কুফা গ্রাম আমার দাদার বাড়ি। এখানে ক্লাস ফোর পর্যন্ত আমি পড়েছি। তারপর বাবা চাচারা

কোনো কর্মে না থাকার কারণে দাদা সিবার উদ্দিন সমস্ত জমি জমা বিক্রি করে দেন। ফলে অভাব দারুণ আকার ধারণ করে। দাদা সাবরেজিস্টার অফিসে দলিল লিখতেন সেই সুবাদে সংসার কোনভাবে চলতো। অভাবের সাগরে ভাসতে ভাসতে পূন্য মাঝির নৌকায় চড়ে অবশেষে একদিন কালিয়াকৈর থানার অন্তর্গত মেদী আশুলাই গ্রামে নানার বাড়িতে উঠলাম। এখানে ৪ বৎসর অবস্থান করলাম ইতোমধ্যে আব্বা একটা চাকরি পেলো। আমি নানার বাড়িতে মাঠে গরু চড়াতাম, হাল বাইতাম, জাল বাইতাম, ধান মাড়াই করতাম, পাট কাটতাম, ধান বুনতাম, গরুর গাড়ি বাইতাম। গাড়ি নিয়ে ৭ মাইল দূরে জাঙ্গালিয়াতে ধান আনতে যেতাম। একদিন গাড়ির ডলনা ভেঙে যায় কুটবাড়ি গ্রামে ছইলা ভুটির বাড়ির কাছে। রাত্রি ১টার সময় গাড়ি ঠিক করে বাড়ি আসি। রাখাল ভাইদের সাথে সব কাজ করতাম। রাখাল ভাইদের নাম উল্লেখ করলাম।

রাখাল ভাই আমিন উদ্দিন, আনর উদ্দিন, হাবুল মিয়া, মাইঠাল ভাই, টুক্কী ভাই, এদের সাথে মিলে মিশে কাজ করতাম। আমি যখন ক্লাস ফাইভের ছাত্র তখন আব্বার চাকরির সুবাদে আমার বাবা মীর্জা মহিদুর রহমান মা শামছুন্নাহার মামার বাড়ি ছেড়ে একটু পূর্বদিকে সাইদের চালা গ্রামে যেয়ে বাড়ি করলেন। গভীর জঙ্গলের ভেতরে বাড়ির ছোট ভাই বোনদের নিয়ে বাস করা খুবই কঠিন। পাহাড়ের বাড়িগুলো অনেক দূরে দূরে। রাত্রি হলেই অন্য বাড়ি থেকে মানুষ ডেকে আনতে হতো। রাতে পাহারা দেবার জন্য ডাকতাম ইছমাইল ভাইকে ইয়ানুছ মাঝে মাঝে এসে আমাদের বাড়িতে থাকতো। রাত্রি যাপন করতো। অভাবতো লেগেই আছে, আব্বার ছোট চাকরিতে সংসার চলতো না। তাই আমি আলক বিড়ি, আনোয়ার বিড়ি হাটে হাটে বিক্রি করতাম। বিশেষ করে মঙ্গলবারে। বড়ইবাড়ি হাট শুক্রবার, কালিয়াকৈর হাটে লাকড়ি, গাব মাথায় নিয়ে বিক্রি করতাম। বড়ইবাড়ি স্কুলে পড়াকালীন আমি গাবতলীর হাট ছৈনটারি হাট থেকে ১০/১৫ মণ ধান কিনে নিয়ে এসে মিলে চাউল তৈরি করে সাভার হাটে নিয়ে বিক্রি করতাম। এইভাবে সংসার চলতো। মায়ের সাথে ঢেঁকিতে ধান ভানতাম মাটি মথে দেয়াল তৈরি করতাম ঘরের। কষ্ট কারে কয় আমি তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। সকালে ১ রুটি খেয়ে স্কুলে যেতাম আবার বিকেলে রাত্রে ১ রুটি খেয়ে ভাই বোনদের নিয়ে বাস করতাম।

পরিবারের সবাই কষ্ট করে মানুষ হয়েছে। তবে আমি ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড় হওয়াতে আমার কষ্টটাই ছিলো বেশি। মা আর আমি নিরলস পরিশ্রম করতাম।

আমাদের সকলের কষ্টটা আব্বাকে দূর থেকে বুঝতে দেই নাই। অন্যের ধানের জমি বর্গাচাষ করেছি। আমার সাথে ছোট ভাই বোনরাও কষ্ট করেছে। আবুবকর, বোন বীনা, ভাই মনির ওয়াদুদ কামরুল সবাই কষ্টে মানুষ হয়েছে।

তবে লাকরী মাথায় করে হাটে হাটে বিক্রি করাটা অনেক কঠিন কাজ ছিলো। ছাত্র জীবনে আমাকে লেখাপড়ার জন্য সাহায্য করেছেন যারা তারা হলেন খবির উদ্দিন, চাপাইরের মোহাম্মদ আলী ডাক্তার ওরফে মাঞ্জু ডাক্তার, আলহাজ খবির উদ্দিন গ্রাম চাপাইর, বড়ইবাড়ি স্কুলের শিক্ষক জনাব আব্দুল হক মাস্টার, ডলার মরতুজ আলী খান হেডমাস্টার, শাহ আব্দুল্লাহহেল, বখতিয়ার স্যার, হেড মাস্টার জয়নাল আবেদীন স্যার, হেড মাস্টার মোকাদ্দেছ আলী স্যার, অজিত কুমার সরকার।

সাভার শিমুলিয়ার গ্রামের কমল বাবু আমাকে আর্থিক সাহায্য করেছে অনেকবার। দারিদ্রতার সাথে সংগ্রাম করে বেড়ে উঠা জীবন। নানার বাড়ি তিন ভাগ ছিলো। হাফেজ উদ্দিন পালোয়ান, নাছিম উদ্দিন পালোয়ান, মফিজ উদ্দিন পালোয়ান এই তিনবাড়ির রাখাল চাকরদের সাথে ও মামা খালাত ভাইদের সাথে খেলাধূলা করতাম। ফুটবল,হাডুডু, লবণদারি, গুল্লাছুট, সি, ডাংটংকী, ডাঙ্গা, সুলখেলা, মারবেল ইত্যাদি খেলা খেলতাম। যাদের সাথে খেলেছি তাদের নাম যথাক্রমে মামা জয়নাল আবেদীন, হযরত আলী, পাক্কু, গফুর, রেজ্জাক, মহিউদ্দিন, রকমান, আমিন, হাবুল, কাজী জোয়াহের ভাই আলমগীর, চান মিয়া, আজাহার, জাহাঙ্গীর, মতিয়ার, টুক্কী, লুৎফর, ওহাব ভাই, আলাউদ্দিন, মতি ভাই, আরফান ভাই, খালপার নামাশুলাই গ্রামের মোয়াজ্জেম ভাইয়ের সাথে মার্বেল খেলতাম। পরবর্তী সময়ে মোয়াজ্জেম ভাই ডাক্তার হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল হাসপাতালের শিশু বিভাগের প্রফেসর, হাসপাতালের ট্রেজারার মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মাদপুরে, কেয়ার হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ক্যান্সার রোগে মারা যান তিনি। অকালে মৃত্যু হয় তার। আপন বোন, মামাত, খালাত বোনদের নিয়ে লুডু, পাশা, চোর-পুলিশ খেলতাম যাদের সাথে তারা হলেন জুলেখা বেগম, জ্যোৎস্না বেগম, মানছুরা আক্তার পান্না, শেলী আক্তার, হাছনা

বেগম লাভলী আক্তার, নূরজাহান, মনোয়ারা দেলুয়ারা আক্তার, পারুল আক্তার, শেফালী আক্তার আরও অনেকেই।

ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শীখা অনির্বাণ উদ্বোধন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। যে সকল রাষ্ট্রীয় অতিথিবৃন্দ এ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তাদেরকে আমি অনেক কাছ থেকে দেখেছি। তারা হলেন তুরস্কের মহামান্য প্রেসিডেন্ট দানিয়েল ডেমিরাল। দক্ষিণ আফ্রিকার মহামান্য প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা। প্যালেস্টাইনের পিএলও প্রধান মহামান্য প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতিবসু।
প্রধান বিচারপতি জে সিদ্দিকী জমিদার পরিবারের গৌরব তথা বাংলাদেশের গৌরব। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করান নাই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- কর্নেল তাহের
- শাজাহান সিরাজ
- নানা নাছিম উদ্দিন পালোয়ান
- দাদা মীর্জা সিবার উদ্দিন
- মামা হাবিবুর রহমান পালোয়ান
- শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ছালাম
- শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবলু
- পিতা মীর্জা মহিদুর রহমান
- মাতা শামছুন্নাহার
- স্ত্রী নাজমা সুলতানা।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আনোয়ারুল হক
- শাশুড়ি দেলুয়ারা বেগ
- শ্বশুর মো. নাছির উদ্দিন আহামদ
- সদর আলী মামা
- খালু নূরুল হক- নাগরপুর
- খালাম্মা আনোয়ারা বেগম (নাগরপুর)
- প্রফেসর অধীর চন্দ্র সরকার
- এডভোকেট হেদায়েত উল্লাহ
- এমরান হাসান
- এডভোকেট দেওয়ান মো. ইব্রাহীম।
- আবু আহম্মেদ সাবেক ভিপি
- সাবেক ভিপি গোলাম ফারুক সিদ্দিকী
- হাজী মহব্বত হোসেন নাইমুর রহমান (রানা)
- মো. আখতারুজ্জামান ফারুখ
- জাহিদুল ইসলাম
- মো. নূরুজ্জামান সুইট
- প্রফেসর মীর্জা মোমেন
- প্রফেসর রাজ্জাক পালওয়ান
- ইসমত জাহান মিষ্টি
- মো. আসাদুজ্জামান আসাদ
- ফরিদা ইয়াসমিন
- ছালমা সুলতানা বর্না
- এডভোকেট হোসাইন আলী
- জিতেন্দ্র নাথ সরকার

- বোন মীর্জা ছালমা আক্তার বীনা
- ভাই মীর্জা আবুবকর সিদ্দিক
- ভাই মীর্জা মনিরুল হক মনির
- ভাই মীর্জা ওয়াদুদ হোসেন
- বোন মীর্জা কামরুন্নাহার কামরুন
- মীর্জা রহমান সামজিদ উজ্জাস
- মীর্জা শামীমা সুলতানা তাঞ্জিল
- আত্মীয় মনির
- ফরিদ ভাই, কুমল্লী নামদার
- বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আতাউর রহমান, চৌহাট
- আব্দুর রশিদ, খালপাড়।